কোইচ্যা সর্দারের বুটজুতা

জীবন সাহা

ফয়তাপুরের নায়েব - কাছারির সামনের ময়দানে তাঁবু পড়েছে। শ্যাওলা রঙের পুরু ত্রিপলের গন্ডা চারেক শক্ত - পোক্ত তাঁবু। খুঁটি পুতে কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে নেওয়া হয়েছে অনেকটা জায়গা। বেড়াল - কুকুরও যাতে সেখানে ঢুকতে না পারে। দশজন মিলিটারির ক্যাম্প হয়েছে এখানে। সামনের গেটে বন্দুকধারী আমেরিকান নিগ্রো সেপাই পাহারা দিচ্ছে। তার জলপাই রঙের উর্দির ওপর ঝাঁ-চকচকে রোদ ছলকাচ্ছে কিন্তু মুখটা যেন অন্ধকার। হয়তো এখন তার মায়ের কথা মনে পড়ছে, কিংবা বোনের, কিংবা প্রেমিকার। কিংবা হয়তো তার চামড়ার রং কালো বলেই এমনটা মনে হচ্ছে। ওর মাপা মাপা পায়ে পায়চারি আর নাদুসনধর শরীর দেখতে, স্কুলে যাওয়ার পথে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ুয়া ছেলেরা কেমন যেন সন্ত্রস্ত আর কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে আছে। কাঁটাতারের বেড়ার ভেতর থেকে অন্য দু'চারজন নিগ্রো সোলজার, স্যান্ডো গেঞ্জি আর ট্রাউজার্স পরে, হাতে করে এঁটো পাউরুটি ও কর্ডশিরে খালি কৌটো ছুঁড়ে ফেলছে সেখানে। একজন ভীত রাখাল - কিশোরকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছে এক সেপাই। কমুনিকেট করতে চেষ্টা করছে। 'কাম কাম, টেক ব্রেড, ইউ গুড, টুমি বালো।' তার সঙ্গীরা হেসে গড়িয়ে পড়ছে। একটা বালিশের সাইজ এটো রুটির না খাওয়া অর্ধেকটা উড়ে এসে পড়েছে রাখালের পায়ের কাছে। চকিতে সেটা তুলে নিয়ে বুভুক্ষু রাখাল ছুটে যাচ্ছে মাঠের ওপারে। দেশে আকাল চলছে। পঞ্চাশের আকাল। এই পাউরুটিটা তার কাছে এই মুহূর্তে জীবনের আশ্বাস। পেছনে সোলজারদের ঠা - ঠা হাসি তাকে আরো দ্রুত ঠেলে দিচ্ছে তার আম্মির দিকে। কতোদিন যে তার আম্মির পেটভরে খাওয়া জোটেনি।

ক্ষুৎপীড়িত গ্রামে লঙ্গরখানা চালানোর দায়িত্ব পেয়েছেন এরফান সাহেব। জনাব এ মহমুকার এক নম্বর মিলিটারি কনট্রাকটার। পোড়াবাড়ি হাটখোলার ঘাটে নোঙ্গর করা আছে তাঁর হাজার - মনি, দেড়হাজার - মনি তিনচারখানা নৌকো। তাদের কোনোটায় চাল, কোনোটায় গম, কোনোটায় চিনি - আটা - ময়দা, সুজি, লবণ, সরষের তেলের টিন এইসব। এখন সেগুলো খালি। শুধু নদী আর বাজারের মধ্যবর্তী ফাঁকা মাঠে, যেখানে ছেলেরা ফুটবল খেলতো, সেখানে চটের বস্তায় স্তূপাকৃতি সাজানো রয়েছে প্রায় হাজার মন চাল। নিচের বস্তাগুলো ধুলোমাটি শ্যাওলায় জীর্ণ হয়ে গেছে। ফেঁসেও গেছে দু'একটা। তার ভেতর থেকে নোংরা নীল তুঁতের দানার মতো কিছু কিছু চাল ছড়িয়ে পড়েছে। সেগুলো ইঁদুর - বাঁদরেও খায় না। একজন চৌকিদার আর দুইজন দফাদার বেটন হাতে এইসব চালের খবরদারি করে।

এরফান সাহেব অতি বদান্য ব্যক্তি। ফুটবল খেলা থেকে বঞ্চিত ছেলেদের বর্ষার শেষেই তিনি কিনে দেন ব্যাডমিন্টন, খেলার সরঞ্জাম। নিজেরর গদির সামনের চটান উঠোনে নিজেই দড়ি ধরে কোর্ট কাটতে লেগে পড়েন ছেলেদের সাথে। তাঁর গোমস্তা নরু গলদঘর্ম হয়ে চুন ছিটিয়ে লাইন ঠিক করে। পাশের কাঁঠাল গাছে বেঁধে রাখা এরফান সাহেবের দেখনশোভা সাদা ঘোড়াটি লাগাম চিবোবার ফাঁকে ফাঁকে চিঁ - চিঁ ডেকে মাটিতে ক্ষুর ঠোকে। বোধহয় এই সব বালখিল্য তঞ্চকতার তার অপার হাসি পায়।

গ্রামের পশ্চিমপ্রান্ত দিয়ে যে দিগন্তবিস্তারী নদী বাজারের পাশে কিঞ্চিৎ দক্ষিণ - পূর্বমুখী হয়ে এলাসিন গ্রামের দিকে এগিয়ে গেছে তার নাম যমুনা। বাহাদুরাবাদের কাছে ব্রহ্মপুত্র থেকে বের হয়ে দক্ষিণমুখী হয়ে পূর্বে জগন্নাথগঞ্জ, পশ্চিমে সিরাজগঞ্জ, আবার পূর্বে চারাবাড়ি পোড়াবাড়ি ছাড়িয়ে এলাসিন হয়ে ধলেশ্বরি পদ্মায় একাত্ম হয়েছে। এর পূর্বপারে ময়মনসিংহ এবং পশ্চিমে পাবনা জেলা, আর নদীর বুকে ছোটবড় বেশ কয়েকটি চলে নতুন নতুন বসত, নতুন নতুন সংসার। বিস্তীর্ণ যমুনায় চলাচল করে শত শত যাত্রী আর মালবাহী নৌকো। চলাচল করতে সুবিখ্যাত দোতলা স্টিমার সার্ভিস কলিগঞ্জ মেল। বরিশাল, বাখরগঞ্জ থেকে উজিয়ে আসে নারকেল, চাল - ডাল আর মুদিখানার নৌকো। আসাম আর উত্তরবঙ্গ থেকে ভেসে আসে বাঁশ ও কাঠের বিশালাকার ভেলা। তাছাড়া যাত্রিবাহী পানসি, গয়নার নৌকো, হাঁটুরে নৌকো, সাপের ঝাঁপিতে ভর্তি বেদের নৌকো, ধান কেটে আনার খোলা নৌকো, ইলিশ ধরার জেলে নৌকো, ছিমছাম কোষা আর ডিঙি, হাজার - মনি, দেড়হাজার - মনি ধান- চালের নৌকো, আর বাহারি বজরা। নৌকোর কি শেষ আছে? বিশ বাইশ বইঠার ছিমছাম ছিপ নৌকোগুলো কী করে? ভাদ্র সংক্রান্তিতে নৌকো বাইচের প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় হয়ে পিতলের ঘড়া - কলসি জিতে তুলকালাম নাচে। আর অন্য দিনগুলোতে? ডাকাতি? হ্যাঁ, তাও করে বৈকি। এই অকালের টালমাটাল সময়ে কোইচ্যা দ্যাওয়ানের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি ছিপ নৌকো যমুনার ডাকাতির কাছে নিযুক্ত। এখন যমুনা নদী ডাকাতের সর্দার কোইচ্যার রাজত্ব। রাজধানী তার কাতুলির চর।

কোইচ্যার অবিশ্যি কোনো লক্ষ্য নেই বাজার-মাঠে পড়ে থাকা এরফান সাহেবের চালের দিকে। তার রাজত্ব নদীতে, সেখানে সে মাছের মতো সাবলীল। ঢালানোর স্টিমারঘাট থেকে এলাসিন, পুরো নদীপথে চলাচলকারী মালবাহী নৌকাগুলো তার লক্ষ্য। চাল - ডাল আটা - ময়দা, তেল-নুন, চিনি - কেরোসিন ভর্তি সরকারী পৌঁছোয় কাতুলির চরে। চরবাসীরা সকলে জড়ো হয়ে কোইচ্যার উঠোন তামুক খায়, বিড়ি টানে, কোইচ্যার কেরদানির ফলাও করা রং—বাহারি কাহিনি শুনে বুক ফোলায় আর তারপর কোইচ্যার ব্যবস্থা অনুযায়ী চার আনা সের দরে চাল, চৌদ্দ পয়সা সের চিনি, চার পয়সা বোতল কেরোসিন কিনে এই দুঃসহ আকালের দিনেও তিনবেলা পেটভরে ভাত খায়। আকালের আঁচ তাদের ছুঁতেও পারে না। আর রাতে? রাতের আরাম হারাম তাদের কাছে। সক্ষম পুরুষেরা জোট বেঁধে চার পাঁচটি ছিপ নৌকোয় প্রয়োজন মতো দাঁড় টানে, লুটপাট করে মালপত্র তোলে নামায়, লাঠি-সড়কি-তীর - গুলতি এমনকি প্রয়োজনে বন্দুক চালায়, অন্ধকারেও তাদের চোখ বাঘের মতো জ্বলে। বয়স্ক পুরুষেরা নদীর ধারে ঘোরে ফেরে, চোখের উপর হাত রেখে দূর দরিয়ায় অন্ধকারে দৃষ্টি বাড়ায়, কোথাও কোনো আলোর ফুটকি কিম্বা কালো ছায়া দেখলে বুঝে নিতে চেষ্টা করে দোস্ত না দুশমন, তারপর দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রয়োজনে সতর্ক করে গ্রামবাসীদের।

টাঙ্গাইল থানার দারোগা আমিনুর হোসেন সাহেব সৎ এবং সাহসী পুরুষ হিসাবে পরিচিত। একদা জনাব খুব দক্ষতার সঙ্গে পোড়াবাড়ি হাটে স্বদেশীদের সবা ছত্রখান করে দিয়েছিলেন। স্বহস্তে বেটন হাঁকিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন সভাপতি অন্নদা বক্সীর। সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবীর ওপর তাজা রক্তের ছোপ নিয়ে অন্নদা যখন জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়ে মাথা উঁচু করে 'মার দিয়ে কি মা ভোলাবি, আমি কি মা'র সেই ছেলে। দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি, কে পালাবে মা ফেলে' গাইতে গাইতে সদলবলে আলিসাকান্দার দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন পথের দু'ধারের বাড়িগুলো থেকে কৌতূহলী মহিলারা উঁকি মেরে এই দৃশ্য দেখে কেমন যেন ভীত আর উদাস হয়ে গিয়েছিলেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জরুরি নির্দেশে উদ্দীপিত আমিনুর, কোইচ্যাকে কায়দা করার জন্য বারকয়ের গভীর রাতে কাতুলির চরে অভিযান চালিয়েছিলেন। জনাব অবহিত ছিলেন, কোইচ্যাকে ধরতে পারলে তাঁর পদোন্নতি অবধারিত। কিন্তু কোনো অভিযানেই পুলিশের দল কাতুলি থেকে কিছু খাসি, পাঁঠা আর মোরগ ছাড়া অন্য কোনো কিসিমের পুরুষ প্রাণীকে বেঁধে আনতে পারেনি। অবশ্য দস্যু ডাকাতের চাইতে এগুলো অনেক নিরাপদ এবং সুস্বাদু প্রতিপন্ন হওয়াতে পরবর্তী অভিযানগুলোতে অংশে নেবার জন্য কনেস্টবলদের

মধ্যে একটা গোপন প্রতিযোগিতাও দেখা গিয়েছিল। শোনা যায়, এরা কেউ কেউ পুলিশের নৌকোতেই দু'একবার দু'চারটে দুগ্ধবতী গাভীও নাকি...কিন্তু সেটা গুজবও হতে পারে।

সর্বেশ্বর ডাক্তার তাঁর দু'ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন একসঙ্গে। দুটোই যমুনার পশ্চিম পাড়ে। বর, বরযাত্রী, বরকর্তা সবাই একসঙ্গে দু'তিনটে পানসিতে যাবেন। সাত দিনের প্রোগ্রাম। তার মধ্যে নদীর ওপরেই কাটবে তিন দিন। ফিরে এসে আবার পাকস্পর্শ। শ'পাঁচেক লোক খাবে। তার ওপর অনাহুত - রবাহুত তো আছেনই। চালটা অন্তত কিনে রাখা দরকার। যা হু হু করে দাম বাড়ছে। সংবৎসর তো নিজেদের ক্ষেতের চালই খাওয়া হয়। কিন্তু নেমন্তন্ন বাড়িতে তো সে চাল চলবে না। ভালো বাসমতির দাম উঠেছে আট টাকা মন। ফিরে এসে হয়তো দেখবেন দশ-এগারো টাকা হয়ে গেছে। তাই নগদ আশি টাকা দিয়ে দশ মন চাল কিনেছেন ডাক্তার কর্তা। ইতিমধ্যে কিশোরি খুড়া বললেন, —'যাইতে আসইসতে দেড় দিন কইরা নদীর বুকে থাইকতে আইবো। প্রশান্তরে কইব্যা বন্দুক নিতে, আর টোটা যানি বেশি কইরা ন্যায়'। প্রশান্ত রায় ডাক্তারকর্তার শ্যালক। দুঃসাহসী শিকারী। গত পাঁচ বছরে শ'দুয়েক বুনো শুয়োর আর একজোড়া গুলবাগা মেরে তিনি গ্রামীণ মানুষের চলার পথে আতঙ্ক দূর করে 'হিরো' হয়েছেন। কিশোরী খুড়োর কথায় ডাক্তারকর্তা হাসলেন। বললেন, 'চিন্তা কোইরবেন না খুড়া। কাতুলির চরের ডাকাইতর‍্যা আমারে ছুঁইবো না।'

—'হ! ছুঁইবো আবার না! ডাকাইতের আবার কোনো ধম্মো আচে নাকি? কবে তুমি কার চিকিচ্ছে কোইরচ আর ওমনি অরা তোমারে ছাইড়্যা দিবো?'

ডাক্তারকর্তা মৃদু হাসলেন। কিশোরী খুড়া তাঁর সমবয়সী। বছরে দু'তিন বার তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে জেলাকোর্টে 'জুরি' হয়ে যান। যাতায়াত, থাকা - খাওয়া, মামলা - সংক্রান্ত বুদ্ধি পরামর্শ, সব একসঙ্গে। পরস্পরকে তাঁরা খুব ভালো করেই চেনেন এবং ভালোও বাসেন। খুড়ার দুশ্চিন্তার কারণটা উপলব্ধি করে ডাক্তারকর্তা বললেন, —'ঠিক আছে। আমি প্রশান্তরে কোইয়্যা রাখুমনি খুড়া। চিন্তা নাই।'

কাতুলির চরের অধিবাসীদের প্রকাশ্য জীবিকা দুধ বিক্রি। পোড়াবাড়ির বাজারে দৈনিক যে দুধ আমদানি হয় তার অনেকটাই আসে কাতুলি থেকে। কোনোদিন সে দুধ ভেজাল বলতে পারেনি কেউ। পোড়াবাড়ির বিখ্যাত চমচম তৈরির ওস্তাদ কারিগর কোকন ময়রা প্রধানত এই দুধের ছানা দিয়েই চমচম বানায়। পোড়াবাড়ি গ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত হাজার হাজার আত্মীয় - অনাত্মীয় ব্যক্তি এই চমচমের স্বাদে মুগ্ধ। কিন্তু তাঁরা কেউ তেমনভাবে চেনেন না কাতুলির লোকদের, যেমন চেনেন ডাক্তার কর্তা। কেউচ্যা দ্যাওয়ান যদি কাতুলির বাদশা, ডাক্তারকর্তা তবে কাতুলির শাহেনশা। যদিও বাদশা কিংবা শাহেনশা বলে সেখানে কেউ তাকে ডাকে না।

কলকাতার থেকে ডাক্তারি পাশ করে গ্রামের মানুষের চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন সর্বেশ্বর। আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে, পারিবারিক অনটন উপেক্ষা করে, তিনি গভীর মানুষের চিকিৎসায় সর্বদা তাঁদের সঙ্গে থেকেছেন। এই প্রত্যন্ত গ্রামে কোথায় ঔষধ, কোথায় চিকিৎসার সরঞ্জাম, কোথায় উপযুক্ত পথ্য! তবু সপ্তরথী- বেষ্টিত অভিমন্যুর মতোই সর্বেশ্বর সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করছিলেন ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড অন্য অজস্র রোগব্যাধির সঙ্গে। প্রথমে তিনি হেঁটে রোগী দেখতে যেতেন, তারপর ঘোড়ায়, অতঃপর ইদানীং সাইকেলে। ক্রমেই দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর ডাক আসতে শুরু করেছে। এমনি ভাবেই এক গভীর রাতে কাতুলি থেকে বাইশ বৈঠার এক ছিপ নৌকো নীরবে এসে ভিড়েছিল বকুলতলার ঘাটে। জনা - ছয়েক বলিষ্ঠ পুরুষ সড়কি আর পাঁচ ব্যাটারির টর্চ হাতে নিয়ে লাফিয়ে নেমেছিল নৌকো থেকে। সতর্কভাবে তারা চলে এসেছিল ডাক্তার কর্তার বাড়িতে। বৈঠকখানায় তখন ঘুমে অচেতন জনা দশেক কিশোর ছাত্র। আগন্তুকদের মধ্যে থেকে দু'জন এগিয়ে গিয়েছিল ডাক্তার কর্তার শোবার ঘরে দিকে। দরজায় টোকা দিয়ে ফিসফিস করে ডেকেছিল— 'ডাক্তার সাব, ডাক্তার সাব।'

সর্বেশ্বর সাহসী পুরুষ। ব্যায়াম করা পেটা শরীর। সাড়া দিয়ে বলেছিলেন— 'কে রে?'

—'আমরা কর্তা, কাতুলির চর থিক্যা আইচি।'

— 'কাতুলির চর?' সর্বেশ্বর থমকেছিলেন। শুনেছেন, নাকি ওখানকার লোকেরা ইদানীং ডাকাতি - ফাকাতি করছে। হ্যারিকেনের পলতেটা উসকে দিয়ে, দরজার পাশ থেকে তেলপাকা লাঠিটা হাতে তুলে নিতে নিতে বললেন—'কী চাই?'

—'কর্তা, আমগো বড়ো বেপদ। ওলাউটায় ধইরছে তিনচারই জনের। আপনে আমাগো সাথে চলেন কর্তা। অগো বাঁচান।' লাঠিটা আবার দরজার পাশে রাখতে রাখতে সর্বেশ্বর বললেন, —'যা, বাইরবারি থিক্যা অনাদিরে ডাইক্যা আন।' হাঁকডাকে শুধু অনাদি নয়, উঠে পড়েছিল পুরো পড়ুয়ার দল। তারপর হ্যারিকেন আর টর্চের আলোয় খোঁজাখুঁজি টানাটানি করে বের করে আনা হলো ডি ওয়াল্ডি কোম্পানির দশ গ্যাল মাপের দুটো চিনামাটির জার। ওতে সর্বদাই বৃষ্টির বিশুদ্ধ জলে লবন মিশিয়ে স্যালাইন ওয়াটার তৈরি করে রাখেন সর্বেশ্বর। কাতুলির জওয়ানেরা সে দুটো কাঁধে তুলে নিয়ে গিয়েছিল নৌকোয়। আর অন্যান্য সরঞ্জাম ভর্তি বাক্সটা নিয়েছিল অন্য একজন। ডাক্তারকর্তা শার্টের ওপর শক্ত করে মালকোচা দিয়ে কাপড় পরে, চাদরটা পাগড়ির মতো করে মাথায় জড়িয়ে, স্টেথো আর কুকুরলাঠিটা হাতে তুলতে তুলেতে স্ত্রীকে বলেছিলেন,—'আমার হয়তো ওখানে দুই চাইর দিন থাকতে অইবো। চিন্তা কইরো না। দরকার হোইলে ধীরুকে খবর দিও।'

কলেরার চিকিৎসায় ডাক্তারকর্তার খুব সুনাম। তিনি কাতুলির চরে থেকে মোট চারজন কলেরা রোগীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনলেন। তাদের মধ্যে একজন স্বয়ং কোইচ্যা দ্যাওয়ানের মা। তখনো কোইচ্যা দলের সর্দার হয়নি। ডাক্তারকর্তা কাতুলি থেকে ফিরে এলেন প্রচুর শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা আর মর্যাদা নিয়ে। কাতুলির লোকেরা তাঁর ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল দুধ, মাছ আর টাটকা শাক-সব্জী। তারপর থেকে প্রতিবছই ডাক্তারকর্তাকে কাতুলির চরে চেয়ে হয় কলেরা রোগীর চিকিৎসার জন্য। প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে কলেরা ভ্যাকসিন দেবার কোনো ব্যবস্থাই করা সম্ভব ছিলো না সেই সময়ে। সুতরাং এই কালব্যাধি মানুষের অজ্ঞতাকে বাহন করে অনেক সময়েই ডাক্তারকর্তাকে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ জানাত।

বাজারে দুধ বেচতে এসেছিল মাসুদ। ডাক্তারকর্তার ছেলেদের বিয়ের সংবাদ সেই পৌঁছে দিয়েছিল কোইচ্যাকে। কোইচ্যা বলে দিয়েছিল ডাক্তারবাবুর পানসিগুলোর ওপর দিনে যেন সাদা নিশান তোলো থাকে আর রাতে যে হ্যাজাক জ্বেলে রাখা হয়। তিন দিনের নদীপথে কোইচ্যার নির্দেশ মানা হয়েছিল যথাযথ, কিন্তু কোথাও কোইচ্যার কোনো ছিপ নৌকো চোখে পড়েনি।

ভাদ্রের ভরা দরিয়ায় এরফান সাহেবের দু'খানা হাজারমনি নৌকো পর পর লুঠ হয়ে গেল ঢালান ঘাটের ভাটিতে। এরফান সাহেব আমিনুর দারোগাকে এজাহার লিখিয়ে খুব ঠান্ডা গলায় বললেন, —'এ ব্যাপারে মিঞাবাইয়ের এন্তেজামের যে কোনোরকম গাফিলতি নাই হেটা তো আমার কোইতে আইবো না। তবে হেদিন কেডা যানি কোইতে আচিলা— আশকারা পাইয়্যা থানায় কনেস্টবলেরা নাকি অ্যাহোন দ্যারোগারও মাথায় উইঠ্যা চায়। এডা ভালো কথা না। আপনের কোনো তকলিপ অইলে কন, আমি মিলিটারি আনামু।' তো, এরফান মিঞার তদ্বিরের জোরেই শেষ বর্ষন্ত মিলিটারি ক্যাপ বসল ফয়তাপুরের কাছারি বাড়ির মাছে। মেহেরবান সরকার বাহাদুরের নেকনজর খিদমতগার বান্দার ওপরে সততই বিরাজমান।

যারা এতদিন ফ্যান, পান্তাভাতের জল, সাদা আলু সেদ্ধ, গেড়ি-গুগলি আর সাপলা-শামুক খেয়ে হাড় আর চামড়ার মধ্যবর্তী

মাংসপেশীগুলীলোকে নিঃশেষ করে ফেলেছিল, রবাহুত অসংখ্য তারা এবার কালো পিঁপড়ের মতো কোথা থেকে যেন সার বেঁধে বেরিয়ে এলো বাজারের পেছনের মাঠে, ত্রিপালে ঢাকা চালের বস্তাগুলোর পাশে, লঙ্গরের লপসি খাবার লোভে। গ্রামের মুরব্বিদের অনুমতি আগেই নিয়েছিলেন এরফান সাহেবে, সহযোগিতা আর তদারকির কাজেও এগিয়ে এসেছিলেন বেশ কয়েকজন সম্পন্ন ব্যক্তি। সুতরাং কোমরে গামছা বেঁধে কাজে নামল ক্লাবের কিশোর কর্মীরা। রান্না থেকে শুরু করে পঙক্তিভোজন করানো, আর যাঁরা প্রকাশ্য পঙ্‌ক্তিতে বসে খাওয়ার সংকোচ থেকে মুক্ত হবে পারেননি, বালতিতে করে তাঁদের ঘরে ঘরে লপসি পৌঁছানো, তারপর ধোয়ামোছা, গোছগাছ, সে এক মহাযজ্ঞ। এই মহাযজ্ঞে অর্থভেদ, জাতিভেদ এক ফুঁয়ে উধাও। ব্রজ চক্রবর্তী আর লালমিঞা দেখা গেল পরিবেশনে সমান ওস্তাদ । জীবন, ক্ষুধা আর মৃত্যু যেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর। এখানে এখন তাঁরা যেন একসঙ্গে একই মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছেন।

অনাহারজনিত কারণে ইতিমধ্যে যে ক'জনের মৃত্যু হয়েছিলো, তাকে এবার বহুগুণে ছাড়িয়ে গেল রোগগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুর পরিমাণ। রক্তআমাশয়, উদারাময়, কলেরা, ড্রপসি, টাইফয়েড, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া— ডাক্তারকর্তার বিশ্রাম নেই, ঘুম নেই। সঞ্চিত স্যালাইন ওয়াটার শেষ হয়ে গেলে, বড়ো বড়ো হাঁড়িতে জল ফুটিয়ে তিনপরত ব্যলাটিং কাগজে ছেঁকে, নুন মিশিয়ে আবার জারগুলো ভরে নেন তিনি। বুধা কম্পাউন্ডার ছাড়াও এবার তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল গ্রামের কয়েকজন স্বেচ্ছাব্রতী তরুণ। পোস্ট অফিস থেকে যতটা সম্ভব কুইনাইন আর মেফাক্রিন ট্যাবলেট সংগ্রহ করা হল। টাঙাইলের রায় ফার্মেসি থেকে পাওয়া গেল কিছু সিবাজল, এন্‌টারোকুইনল, সালফাগুয়ানিডন ট্যাবলেট, কিছু ব্লিচিং পাউডার আর পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, —ব্যাস! এইটুকু মাত্র সম্বল করেই ডাক্তারকর্তা, ডন কুইকজোটের উইন্ডমিলের সঙ্গে ডুয়েট লড়াই মতো, লড়াইয়ের ময়দানে অকুতোভয়।

ইতিমধ্যে মিলিটারি লঞ্চ তোলপাড় করছে যমুনার জল। জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে থেকে এলাসিন, এই দীর্ঘ জলাঞ্চল চুড়ে চলেছে নিগ্রো সেনাদলের উচ্ছ্বসিত জলবিহার। উদ্দেশ্য, ডাকাতদলকে খুঁজে বের করে নিকেশ করা। প্রকৃতপক্ষে দিনের বেলায় তারা মালবাহী নৌকাগুলোকে খানিকটা এসকর্ট করলেও, গভীর রাতে ডাকাতদের পশ্চাদ্ধাবন করার দুঃসাহস দেখায়নি। সুতরাং কোইচ্যা দ্যাওয়ান যতা পুর্বং তথা পরং।

একদিন কিশোরি খুড়া বললেন, —'সর্বেশ্বর, প্রসন্নর কাছ থিক্যা গত মাসে বিশ টাকা কোইর‍্যা যে কয় বস্তা রেশনর চাইল কিন্যা রাকচিলাম, অ্যাহোন ব্ল্যাকে আশি টাকা মন দান দিব্যার দায়। বেচুম?' ডাক্তারকর্তা কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন খুড়ার মুখের দিকে। তারপর হেসে ফেললেন। বললেন, —'আপনে আর কোনোদিন 'জুরি' তে যাইয়েন না খুড়া। আপনের আসামীর কাঠগড়ায় খাড়া করাইলে আমি তো আপনেরে ফাঁসির হুকুম দিমু।' গম্ভীর হয়ে কিশোরি বললেন, —'আপনে 'জুরি' না অইলে আপনেরেও কিচু কওনের অচিলো না।'

বিকেলে কিশোরি এলেন এরফানের গদিতে। এরফান লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, —'আদাব চাচা, আদাব। আপনে নিজ ক্যান কষ্ট কোইর‍্যা আইলেন আমার গদিতে? বান্দারে এত্তেলা দিলেই আইতো। আরে নরু, চাচারে তামুক দে।' নরু রূপাবাঁধানো হুঁকোটো নামিয়ে ভালো করে ধুয়ে, জল পাল্টে তামাক সেজে এনে দিলে, কিশোরি চোখ বুজে আমেজ করতে তাতে দুটো টান দিয়ে বললেন,— 'তাহলে, চাইল সব পাচার কোইর‍্যা দ্যাওনের কামে কোনো অসুবিদ্যা তো অয় নাই?' এরফান দু'হাতে দু কানের লতি ছুঁয়ে জিব কেটে বললেন,—'তওবা তওবা। এডা কী কোইলেন চাচা? আমি সরকারি ঠিকাদার। মিলিটারিরে চাইল ডাইল নুন ত্যাল...।' ডান হাতে হুকো থাকতে বাঁ হাতখানা কিশোরি বরাভয় মুদ্রায় তুলে ধরলেন এরফানের নাকের সামনে। হুকো থেকে মুখ তুলে বললেন, —'হঃ! ইডা তো হক কতা। তুমি সরকারের মাল দ্যাও, আন্দারেও ব্যাচো, আবার ছারপোকা খাওয়াইয়া বেহস্তে যাওনের পাকা ব্যবস্তাও কইর‍্যা রাখে। ঠিকই তো। ঠিক কামই কোইরতাচো।' স্পষ্টতই বিচলিত এরফান কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বললেন, —'আমাগো তো চাচা আমদানি-রপ্তানি। মাল আইতাচে, মাল যাইতাচে। কতো মাল আসে, কত মাল যায়, সরকারের ঘরে তো তার হিসেব থাকে। তাছাড়া, পোলাপানের খ্যালার মাঠটা অনেকদিন অটকা আচিলো, অগো দিকটাও তো দ্যাহোন লাগে। তাই দিলাম খালি কোইর‍্যা।'

—'ভালো কোরচ, খুইব ভালোর কোরচ। তা তোমার ওই লঙ্গরখানার জন্য কত করচ অইতাচে?'

—'না, লাঙ্গরে আর আমার খরচ কী? আলার দোয়ায় আমার কতো চাইল নষ্টো অইয়্যা যায়! কতো উন্দুর বান্দোরে খায়। দুইখান হাজারমনি নৌকাতো ডাকাইতে লুইট্যা নিলো। তাতে আর কি অইচে? রোজ আধমন কোইর‍্যা চাইল আমি দিতাচি লাঙ্গরে। যতীন চাচা দুই বস্তা খেসারির ডাইল দিচে। প্রসোন্ন চাচা তিন বস্তা চাইল দিচে, রিদয় কর্তারকর্ত আর আপনেও তো রোজ কিচু না কিচু দিতেই আচেন। কতায় আচে না—দশ মিল্যা করি কাজ! তা ভালো কতা। আপনেও তো হুইনচি কিছু রাখি কোরচিলেন, আচে, না ছাইড়্যা দিচেন?'

—'নাঃ।' কিশোরি খুড়া হুঁকোটা নরুর দিকে এগিয়ে দিলেন। নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, — 'ছাইড়্যার যাইয়্যাও ছাইড়্যার পাইরলাম না। রাইমোহন আশি টাকা মন দাম দিচিলো। তো সর্বেশ্বর কোইলো, ও যদি জজ অইতো, তাহলে নাকি আমারে ফাঁসিতে লটকাইতো। একথা তোমার চাচি কোইলো, —ও পাপের চাইল তুমি পুণ্যের কামে লাগাও। সব চাইল লঙ্গর খানায় দিয়্যা দ্যাও। তা দিমুনে পাঠাইয়্যা।'

এরপর দু'জনেই চুপ-চাপ। চেতনার গভীরে ডুব দিয়ে দু'জনের মনই এখন সুমতি-কুমতির সওয়ালে জবাবে জেরবার।

দুপুরের দুধের বাজারে একটা চাপা উত্তেজনা দেখে বাউল দত্ত তার বেনেতি দোকান থেকে বেরিয়ে মাসুদকে সামনে পেয়ে বলল, —'কীরে মাসুদ! আর কী ফিসুর ফিসুর কোইরতাচে?' মাসুদ দ্রুত চারধারে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, —'কাউরে কোইয়ো না চাচা, হুইনতে আচি কোইচ্যা নাকি মিলিটারির হাত কাইট্যা নিচে। দোকান বন্ধ কোইর‍্যা বাড়িৎ যাও। হজ্জোৎ হোইবার পারে।' পলকে সারা বাজারের রটে গেল কথাটা। দোকানপাট বন্ধ হতে থাকল। ইতিমধ্যে থানা থেকে ৮-১০ জন লাল পাগড়ি পুলিশ পৌঁছালো হাটখোলায়। থানার দারোগা আমিনুর হোসেন সাইকেলে চেপে এরফান মিঞার গদির সামনে এসে নামলেন। এরফান হাঁক দিলেন—'নরু, নরু কোতায় গেলিরে? দারোগা সায়েবের তামুক সাইজ্যা দে তাড়াতাড়ি।' আমিনুর বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন,— 'আচ্ছালামু আলাইকুম।' এরফান বললেন,— 'আলাই কুম উস্‌সালাম। আহেন, আহেন, ওই চেয়ারডায় বহেন। তামুক খান। জিরান একটু। ওরে নরু,...'নরু হুঁকোর মাথায় কলকে বসিয়ে তাতে ফুঁ দিতে দিতে এগিয়ে এসে আমিনুরের হাতে হুঁকো তুলে দিলে বললেন, — 'কোকনের দোকান থিক্যা চাইরহান চমচম নিয়্যা আয়।' নরু চলে গেলে আমিনুর হুঁকোয় একটা সুখটান দিয়ে বললেন, —'মিঞাবাই, ইবার আপনের ক্যারদানিট্যা একটু দ্যাহানের সময় অইচে।' এরফান বললেন— 'খোলসা কোইর‍্যা কন।' আমিনুর তো বেহুদা এজাহার ল্যাখাইচিলেন, আপনের দুইহান হাজারমনি নাও কোইচ্যা লুট কোইর‍্যা নিচে। তাই আপনে ড. এম. এর কাচে মিলিটারি প্রোটেকশন চাইছিলেন। আপনের আর্জিমাফিক ফয়তাপুরের নায়েব কাছারির মাঠে মিলিটারির ক্যাম্প হইচে। পর্শু রাইতে কোইচ্যার সাথে মিলিটারির এককাউন্টারের সময় দু চারজন ডাকাইত গুলিতে জখম অইচে। এদিকে ডাকাতের গুলিতে এক মিলিটারিও বেজায় জখম অইচে। তার রাইফেল জলে পইরা তলাইয়্যা গ্যাচে। এই ব্যাপারে সে. ডি. ও সায়েব আমাদের তলব কোইরছিলেন। তাঁর হুকুমত্ হইলো, —যেমুর কোইর‍্যা পারো কোইচ্যারে ধরো। আমি সাত দিন দেহুম। তারপরে পুলিশের ওপর অ্যাকশন নিমু।, তাই আপনের কাছে আইলাম। কথাডা য্যান গোপন থাকে। আইজ রাতেই কাতুলির চরে আর আশেপাশে, পুলিশ আর মিলিটারির জয়েন্ট অ্যাকশন শুরু অইবো। আপনে মেহেরবানি কোইর‍্যা আমার ৮-১০ জন পুলিশের আপনের গদিতে একটু লুকাইয়া রাখার ব্যবস্থা কোইর‍্যা দিবেন।। নরুরে কোইবেন

অগো যানি একটু তদবির তদারকি করে। গভীর রাইতে ওরা নৌকায় উইঠ্যা কাতুলি যাইবো।' এরফান বললেন, —'জনাবের যদি ততে সুবিধ্যা হয়, তাইলে আইচ্ছা।'

কোকন ময়রার চমচমের তুলনা নেই। শুকনো খীরের গুড়োয় জড়ানো যেন এক এক টুকরো মৌচাক। চাপ দিলে ভাঙলে দেখা যাবে ভেতরে মৌচাকের মতো সমঞ্জল ছিদ্রগুলো টসটসে মধুর মতো ঘন মিষ্টির রসে টই - টুম্বুর। মুখে রেখে চাপ দাও। সমস্ত মুখগহ্বর আর খাদ্যনালী জুড়ে অমৃত! অমৃত! আমিনুর অর্ধেক চমচম মুখে পুরে চোখ বুঝলেন। তাঁর বাঁ হাতের আঙ্গুলের ডগায় ধরা মাটির মালসাটাতে আরো সাড়ে দিনখানা জ্যান্ত চমচম। নরু কুঁজো থেকে কাঁচের গ্ল্যাসে জল ভরে এনে হাতে ধরে, দারোগা সায়েবের রসিয়ে রসিয়ে চমচম খাওয়াটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখল। তার মনে হল, জল সুদ্ধ গেলাসটা দারোগার মাথায় ছুঁড়ে মারলে কেমন হয়? কিন্তু পর মুহূর্তেই সে নিজেকে সামলে নিল। মনে মনে 'তওবা তওবা' বলে নিজের কুমতিকেই বোধ হয় গালি দিল 'শালা ইবলিসের বাচ্চা।'

সারারাত ঘামাসান লড়াইয়ের পর সংযুক্ত বাহিনী কাতুলির আর তার আশপাশের এলাকা থেকে যে কয়েকজন পুরুষকে ধরে এনে পুলিশের হেফাজতে দিয়েছে, তদের মধ্যে প্রতিটি বলিষ্ঠ লোককেই কোইচ্যা বলে সন্দেহ হলেও, আসল কোইচ্যার দিকে তাদের আদৌ নজর পড়েনি। বরং মনে হয়েছে এ ছোকরা বড়জোর কোইচ্যার একজন খিদমতগার হলেও বা হতে পারে। ফয়তাপুরের নায়েব কাছারির উঠানে সবগুলো ডাকাতকে একটা মোটা বড় দড়ি দিয়ে কোমর বেঁধে সারিবদ্ধভাবে বসিয়ে রেখে, আমিনুর দারোগা একটা পাসিং শো সিগারেট ধরিয়ে বাঁকা-বিহারীটি হয়ে দাঁড়িয়ে, বঙ্কিম দৃষ্টিতে ওদের নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। সকালের সূর্য তখন দিগন্তের একলগি ওপরে উঠেছে। রাস্তার ধারের গাছপালাদের ছায়াগুলো লম্বা হয়ে মাটের ওপর শুয়ে খুব আস্তে আস্তে ছোটো হয়ে যাচ্ছে। আমিনুর পোড়া সিগারেটটায় একটা সুখটান দিয়ে টুকরাটা ছুঁড়ে ফেলে, আট কদম এগিয়ে এসে, সবচেয়ে বলিষ্ঠ লোকটার চুলের মুটিতে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললেন, —'তগো মইধ্যে কোইচ্যা ক্যাডা? তুই?' হঠাৎ আক্রমণেও নির্বিকার লোকটা মাছের চোখের মতো ঠান্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, — 'জী'। আমিনুর চুলের গোছা ধরে তাকে টেনে তুলে বুটশুদ্ধ পা দিয়ে তার পাছায় কষে একটা লাথি হাঁকিয়ে বললেন, —'হুম! তুইই তাহলে আসল মাল?'

—'না। ও কোইচ্যা না। আমি কোইচ্যা।' আমিনুর দারোগা চোখ কুঁচকে দেখলেন সেই রোগা পটকা লোকটা উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। কত হবে ওর বয়েস? চব্বিশ, ছাব্বিশ, আঠাশ? কালো হিলহিলে চেহারা। কালচে শ্যাওলার মতো হালকা গোঁফ-দাঁড়িতে মুখটা আরো কালো দেখাচ্ছে। চোখ দুটো উজ্জ্বল, ঝকঝকে দাঁত— এটুকুই যা দেখবার। আমিনুর সাহেব চোখ কুঁচকে রেখেই তিন হাত এগিয়ে এসে লোকটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, — 'তুই? কোইচ্যা? তুই?' লোকটা বলল, —'জী হুজুর, আমিই কোইচ্যা, বাজানের নাম চেরাগ আলি দ্যাওয়ান, হাল সাকিন...।' —'হুম!' আওয়াজ করে আমিনুর দারোগা আচম্বিতে একটা আধমনি ঘুঁসি হাঁকালেন চোইচ্যার নাক বরাবর। চকিতে কোইচ্যা নিচু হতেই আমিনুর হুড়মুড় করে পড়লেন তার কাঁধের ওপর। কোইচ্যা অধিকতর পতনের হাত থেকে আমিনুরকে বাঁচিয়ে, ঠেলে দাঁড় করিয়ে দিতেই, পুলিশ এবং ডাকাতের সম্মিলিত হাসির একটা চাপা তরঙ্গ আমিনুরের কানে যেন তরল আগুন হয়ে ঢুকল। তবু তিনি নিজেকে সংযত করে হাবিলদার শিবু সরকারকে বললেন,— 'আসামিগো ওটাও। থানায় নিয়্যা চলো'। শিবু তার বেটন দুলিয়ে ডাকাতদলকে দাঁড় করালো, তাদের সামনে পেছনে এবং দুই পাশে দশজন কনেস্টবল পজিশন নিল। আমিনুর বললেন, —'চলো'। দড়িতে টান পড়ল। সবাই চলতে উদ্যত। কিন্তু রুখে দাঁড়াল কোইচ্যা। — 'আমি যামু না।' সে চেঁচিয়ে উঠল। আমিনুর নিজেকে অতি কষ্টে সংযত করলেন। ইতিমধ্যে রবাহুত লোকজন এবং পড়ুয়া কিশোরদের ভিড় জমেছে ডাকাত দেখার জন্য। গ্রামের চার-ছয় জন মোড়ল মুরুব্বিও এসেছেন। নায়েব সেরেস্তা থেকে দু'চারজন গোমস্তা খানসামাও এসেছে। এদের সামনে মাথা গরম করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, এটা বুঝেই শান্তকণ্ঠে তিনি বললেন, —'যাবিন্যা মানে? ডাকাইতের সর্দার আইচস্, পুলিশের হাতে ধরা পইর‍্যা কস্ থানায় যাবিন্যা? মামাবাড়ির আব্দার। নে চল।' কোইচা তেমনি জেদি ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমিনুর ঠান্ডা গলায় বললেন, — 'ভালো চাষ তো ওঠ কচিমুদ্দি। থানায় চল।' কোইচ্যা বলল, —'আমারে থানায় নিতে অইলে জুতা কিন্যা দিতে অইবো। আপনের নাগাল বুটজুতা। আপনের মান আছে, আমার মান নাই?' চারদিক থেকে হাসির রোল উঠল। হাসবেন না কাঁদবেন আমিনুর? দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, —'এহানে অ্যাহোন তুই জুতা পাবি কনে? থানায় চল। টাঙ্গাইলের দোকান থিক্যা কিন্যা দিমু।' কিন্তু কোইচ্যা তাতে রাজি নয়। সে তার দলবল নিয়ে আবার মাটিতে বসে পড়ে। অনেকটাই যেন অসহযোগের ভঙ্গিতে। শিবু সরকার বেটন তুলে তাদের দিকে ধেয়ে গেলে কোইচ্যা বলে, — 'থামেন দেহি দারোগা সাহেব। মাইর ধোইর কোইর‍্যা যদি কিছু অইতো, তাহলে গান্ধি আর গান্ধিজী অইতো না। আপনের মারোনের কাম কী? তার থিক্যা এক জোড়া জুতা আনাইয়্যা দিয়্যা আসামিগো থানায় নিয়্যা যাওন যায় না? নায়েব মশয় আসুক, আমি কোইলে জুতার দাম নায়েব মশইয় দিয়্যা দিবো।' আমিনুর দীর্ঘক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে কুদ্দুস সায়েবের দিকে তাকিয়ে থেকে নিজেকে দমন করে বললেন,—'ঠিকাছে, আপনের যখন খায়েশ অইচে...। জুতার দাম নায়েব মশায়ের দিতে অইবো না। আসামির সব খরচ সরকার বাহাদুরই দিবো।'

ফয়তাপুর থেকে টাঙ্গাইল, জেলা বোর্ডের রাস্তায় তিন মাইলের পথ। আমিনুরের কাছে থেকে টাকা আর নায়েব সেরেস্তা থেকে একটা সাইকেল নিয়ে কনেস্টবল নুর আলম এক ঘন্টার মধ্যেই এক জোড়া ঝাঁ-চকচকে বুট জুতা কিনে আনলেন, ঠেসে ঠুসে সে দুটো ভেতরে পা ঝোকাল কোইচ্যা। ফিতে না - বাঁধা অবস্থাতেই একটু টাইট হলো পায়ে। তরুণ ডাকাত সর্দার তাতেই বেজায় খুশি। জুতা পায়ে সোজা দাঁড়িয়ে এবার সে আমিনুর দারোগাকেই হুকুম করল। —'চলেন দেহি দারোগা সাব। জোর কদমে হাঁটা লাগান।'

কাবিলাপাড়া আর সন্তোষ স্কুলের ছাত্ররা তখন স্কুলের দিকে হাঁটছে। হাইলচ্যা গাঁথা ডাকাতের দল আর প্রহরী পুলিশের দেখে, তাদের আর পথচারীদের উত্তেজনার অন্ত নেই। তারা বিশৃঙ্খল ভাবে হেঁটে ওদের অনুসরণ করছে। রাস্তার ধারের বাড়িগুলো থেকেও ছুটে আসছে অগুণিত মানুষ। অনুসরণকারীদের দল ক্রমেই বড় হচ্ছে। এমন গাছের ছায়া আর প্রলম্বিত নয়। রোদ উঠেছে। এত লোকের চলাচলে পথে ধুলো উড়ছে।

পুরু ক্রোম চামড়ার বুট বুতোয় কোইচ্যার পায়ে ফোস্কা পড়েছে। সে বেশ খুঁড়িয়ে হাঁটছে। ক্রমে পোস্কা ভেঙে রস এবং তার পরে ক্ষতবিক্ষত পা থেকে রক্ত চুঁইয়ে পথের ধুলোর সাথে মিশে পা আর জুতার মধ্যে চট্‌চট আঠার মতো লেপটে থাকছে। তবু কোইচ্যা নির্বিকার। হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু সে তা গ্রাহ্যই করছে না। তার চোখেমুখে এক গর্বিত আত্মশ্লাগা খেলে বেড়াচ্ছে। এত কষ্টের মধ্যেও তার চিল্‌চসপি একটাই। বাগে পেলে সে এখন বুটজুতা পরা পা দিয়ে আমিনুর দারোগার পাছায়ও একটি লাথি মেরে দিতে পারবে। যেমন করে আমিনুর লাথি হেঁকেছিল বসিরের পাছায়।

কল্পনায় দৃশ্যটি দেখে কোইচ্যার ঠোঁটের কোণে তৃপ্তির হাসি উপচে ওঠে। জুতার ভেতরে ক্ষতবিক্ষত পায়ের কথা তার আর একদম মনে থাকে না।